বিস্মৃত স্মৃতিচারণ

মোঃ হায়াত আলী

ময়ূখ প্রকাশনী

বিস্মৃত স্মৃতিচারণ

মোঃ হায়াত আলী

ময়ূখ প্রকাশনী
ঢাকা

উৎসর্গ ঃ

“বাবাকে”
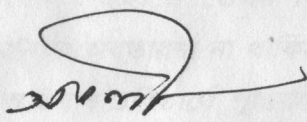
ভূমিকা

নদীর স্রোত ও সময় নিরবধি বহিয়া যায় আপন গতিতে। প্রবাহমান কালের স্রোতধারায় ধীরে ধীরে মানুষের জীবন বিকশিত হয় সমাজ ও সংসারের কলরবে–কলবরে। সময়ের সাথে সাথে সমাজের বিবর্তন ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিবে। যেদিন গত হইয়াছে, যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে উহাকে আমরা মনে রাখিতে চাহিনা, অথবা স্মরণে রাখার প্রয়োজন বোধ করিনা। তবে একথাও ঠিক যে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের একটা নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। বর্তমান যখন অতীত হইয়া যাইবে তখন ভবিষ্যত বর্তমানের স্থানটি দখল করিয়া লইবে। অতীত নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী তবে ক্রমশঃ অপসৃয়মান। বর্তমান ক্ষণস্থায়ী ও চলমান। ভবিষ্যৎ সুপ্ত, অনির্দিষ্ট ও অজানায় আচ্ছন্ন। এই জন্যই অতীত অত্যন্ত মূল্যবান।

আমার এলাকার সদ্য অতীতের সমাজ ও হারাইয়া যাওয়া কিছু মানুষের স্মৃতিচারণের জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। ইহাতে তেমন বিখ্যাত ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা না থাকিলেও আজ অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সে হৃদয়ের কিছুটা অভিলাষ চরিতার্থে পুস্তিকাটি প্রকাশ করিলাম। কোন পাঠক যদি বইটি পাঠ করিয়া সামান্যতম উপকৃত ও উল্লসিত হন তবে আমার "বিস্মৃত স্মৃতিচারণ" সার্থক হইবে।

আল্লাহ হাফেজ

মোঃ হায়াত আলী

১লা বৈশাখ, ১৪০৩

পুণ্যবতী স্নেহময়ী পরমা শ্রদ্ধেয় মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্বপ্রথম যে স্থানের মাটি স্পর্শ করিয়া আলোর মুখ দেখিয়াছি, যে স্থানের বাতাসে সর্বপ্রথম শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়াছি এবং যে গ্রামের পরিবেশে শৈশব এবং কৈশোর জীবন অতিবাহিত করিয়াছি সেই পূণ্যভূমি জন্মভূমি গ্রামের নাম "ভবানীপুর" একটা ছোট্ট গ্রাম। আমাদের বাড়িসহ আমাদের বাড়ীর লাগ পশ্চিম দিকের একটা বাড়ী এবং দক্ষিণ দিকের একটা বাড়ী - এই তিনটা মাত্র বাড়ীই ভবানীপুর মৌজায় অবস্থিত। আমাদের বাড়ীর পূর্বদিকের সব মুসলমান বাড়ী এবং সব হিন্দু কাপালী বাড়ী রামবাটি মৌজায় অবস্থিত। সমস্ত হিন্দুরা চলিয়া যাওয়ায় বর্তমানে ঐ সব হিন্দু বাড়ী মুসলমানেরা ক্রয় করিয়া বসবাস করিতেছে। ভবানীপুর মৌজায় পশ্চিম দিকের সমস্ত বাড়ী বহরাবাড়ী মৌজায় অবস্থিত। হিন্দু-কাপালী বসতি পূর্ণ ইয়ারপুর গ্রামের লাগ পূর্ব দিকের মাত্র একটি বাড়ীই যুগিন্দা মৌজায় অবস্থিত। মুসলমান বসতিপূর্ণ এই ভবানীপুর, রামবাটী, বহরাবাড়ী এবং যুগিন্দা একমাত্র যুগিন্দা গ্রাম নামেই বহুল পরিচিত। এই চারি মৌজার সকল মুসলমান অধিবাসীই একই গ্রামের লোক বলিয়া মনে করিতেন এবং একই সমাজভুক্ত ছিলেন।

আমাদের গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের সকল মুসলমান হিন্দুই কৃষি নির্ভর ছিলেন। প্রায় সকলেই দরিদ্র এবং নিরক্ষর ছিলেন। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব মোহাম্মদ বানুমোল্লা ব্যতীত ঐ সময়ে আশে—পাশের কোন গ্রামেই কোন লেখাপড়া জানা লোক ছিলো না। আঠার শত শতাব্দীর নব্বুইয়ের দশকে আমার পিতা আররা কুমেদ ত্রিপুরা সুন্দরী স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়াছিলেন।

তখনকার দিনে ঐ অঞ্চলের প্রায় সকলেই পাটখরি বা ছনের বেড়াযুক্ত ছোট ছোট ছনের দোচালা ঘরে বসবাস করিতেন। টিনের ঘর খুবই কম ছিল। আমাদের গ্রামে জনাব নজিবুল্যা শেখের বাড়ী এবং আমাদের বাড়ী ছাড়া আর কাহারও বাড়ীতে টিনের ঘর ছিল না। প্রায় বাড়ীতেই কোন চৌকি ছিল না। সকলেই মাটিতে বিছানা করিয়া রাত্রে ঘুমাইত। শীতকালে সকলেই ধানের খড় বিছাইয়া বিছানা করিত। আমরাও শীতকালে চৌকির উপর খড় বিছাইয়া বিছানা করিয়া রাত্রে ঘুমাইতাম। শীতকালে এই প্রকার খড়ের বিছানা আরামদায়ক। স্যান্ডেল মহাশয়ের নাম কেহই জানিতাম না। সকলেই বাড়ীতে বৌলাওয়ালা কাঠের খরম ব্যবহার করিতেন, কচিৎ চটি জুতা ব্যবহৃত হইত। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রায়

অপরাহ্নে পূর্বাহ্ন

মোঃ হায়াত আলী

ময়ূখ প্রকাশনী
ঢাকা

সকলেই ধুতি পরিধান করিতেন। মুসলমানেরা কেহ কেহ লুঙ্গিও ব্যবহার করিতেন। আট-নয় আনায় ৯½ হাত লম্বা একখানা ধুতি এবং পাঁচ-ছয় আনায় একখানা লুঙ্গি পাওয়া যাইত। এক জোড়া কাঠাল কাঠের খরমের দাম ছিল দুই আনা হইতে তিন আনা।

ভাত, ডাল, তরিতরকারী ইত্যাদি মাটির পাতিলে রান্না করা হইত। বর্তমানে এলুমিনিয়ামের অত্যাচারে ঐ সব মাটির জিনিসপত্রের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। কাসার থালা, গ্লাস, ঘটিবাটী সবাই ব্যবহার করিতেন। গরীবেরা মাটির সানকিতে ভাত খাইতেন এবং মাটির বদনা ব্যবহার করিতেন।

প্রায় বাড়ীতেই পুরুষদের জন্য কোন শৌচাগার ছিল না। সরকারী পতিত জায়গায়, খালবিলের ধারে বা বাড়ীর নিকটের ঝোপ জঙ্গলের আড়ালে প্রায় সকলেই মলত্যাগ করিত। পানির ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত হতাশাজনক। বর্ষার সময়ে বর্ষার পানি এবং শুক্না মৌশুমে খাল, বিল, ডোবা নালার পানি ব্যবহার করিতে হইত। ফাল্গুন, চৈত্র মাসে ডোবানালার পানি শুকইয়া গেলে বাড়ীর নিকটে জমিতে মাটির কুয়া খনন করিয়া পানির ব্যবস্থা করা হইত। আবার বৈশাখ-জৌষ্ঠ মাসে যখন প্রবল বৃষ্টির দরুণ মাটির কুয়া বন্ধ হইয়া যাইত, তখন নিচু জমির ধানখেতে জমিয়া থাকা বৃষ্টির পানি আনিয়া কাজ চালাইতে হইত। কোন গ্রামে কোন পাট কুয়াও ছিল না। খুব সম্ভব ১৯২৩/২৪ সনে ইউনিয়ন বোর্ড হইতে কতক কতক গ্রামে প্রথম পাট কুয়া দেওয়া আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে ইউনিয়ন বোর্ড হইতে আমাদের গ্রামের কেতাব আলীদের বাহির বাড়িতে একটা পাট কুয়া দেওয়া হইয়াছিল। মিরপুরহাটে, তেরশ্রীহাটে এবং ঘিওর হাটে একটা করিয়া খুব বড় রকমের তিনটা ইন্দারা দেখিয়াছি। শুনিয়াছি দৌলতপুরের কোন দানশীল হিন্দু ভদ্রলোক ঐ তিনটা ইন্দারা জনসাধারণের জন্য নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তেরশ্রীহাটে এবং মিরপুর হাটের ইন্দারা দুইটা এখনও বিদ্যমান।

যাতায়াতের জন্য কোন ভাল রাস্তা ঘাট ছিল না। বর্ষকালে নৌকায় হাটে বাজারে বা যে কোন জায়গায় যাতায়াত করা যাইত। পর্দ্দানশীন মহিলারা বর্ষকালে নৌকায় যাতায়াত করিতেন, কিন্তু নৌকার ছৈ কাপড় দিয়া এমন ভাবে ঘিরিয়া দেওয়া হইত যে মহিলাদের ছায়া পর্য্যন্ত বাহিরের কেহ দেখিতে পাইত না।

শুকনা মৌশুমে পাল্কি বা বাঁশের ডুলিতে চড়িয়া মহিলারা যাতায়াত করিতেন।

পশ্চিম বঙ্গের দারভাঙ্গা, মুংগের, বিহার প্রভৃতি স্থান হইতে আগত বেহারারা ঐ ডুলি বা পালকি বহন করিত। ঐ সব পশ্চিমা বেহারারা অগ্রহায়ণ মাসে আসিয়া হাটে বাজারে এবং গ্রামের আমগাছ, বটগাছ ইত্যাদির নিচে নাড়া দিয়া কুড়া ঘর তৈয়ার করিয়া থাকিত এবং পালকিও ঢুলি বহন করিত। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বর্ষার পানি আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা দেশে চলিয়া যাইত। তখনকার দিনে রক্ষণশীল পরিবারের কোন মুসলমান মহিলা পায়ে হাটিয়া চলা-ফেরা করা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং সামাজিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। শুকনা মৌশুমে ঢাকা যাইতে হইলে, পায়ে হাটিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না। আমার পিতা বহুবার পায়ে হাটিয়া ঢাকা যাতায়াত করিয়াছেন। আমি নিজেও একবার পায়ে হাটিয়া ঢাকা গিয়াছিলাম এবং ঢাকা হইতে হাটিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিলাম। বর্ষাকালে মানিকগঞ্জ হইতে গয়নার নৌকায় ঢাকা যাতায়াত করা যাইত। সন্ধ্যার পর ঢাকা হইতে বা মানিকগঞ্জ হইতে গয়নার নৌকা ছাড়িত এবং পরদিন ভোর ৭/৮ টা ৯টার মধ্যে ঢাকা বা মানিকগঞ্জ পৌছিত। ভাড়া ছিল আট আনা করিয়া জন প্রতি। অপেক্ষাকৃত ভাল স্থান নৌকার পিছনের দিক হিন্দুদের জন্য নিদ্দিষ্ট করা থাকিত এবং মুসলমান যাত্রীদের জন্য নৌকার সামনের দিক নির্দ্ধারিত থাকিত। এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার জন্য ভাড়ার কোন হের ফের ছিল না।

শ্রাবণ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত সময়টা প্রায় সবারই জন্য অবসর সময় ছিল। ঐ সময়ে রাত্রিকালে মাঝে মাঝে পুথি পাঠের আসর বসিত। তালুকনগর গ্রামের জনাব খবির উদ্দিন মুন্সী সাহেব ভাল পুথি পাঠ করিতে পারিতেন এবং গ্রামের জনাব বশরত মাতবরও পুথি পাঠ করিতেন। মাঝে মাঝে কেচ্ছা কাহিনী বলারও আসর বসিত। মিরপুর গ্রামের একাব্বর শেখ নামক এক ব্যক্তি আমাদের গ্রামে বাড়ী করিয়াছিলেন। তিনি অনেক রকম কেচ্ছা কাহিনী জানিতেন এবং বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে তাহা প্রকাশ করিতেন, গ্রামের জনাব আলী শেখ ও রহিমউদ্দিন শেখ উক্ত একাব্বর শেখের নিকট হইতে বহু রকম কেচ্ছা কাহিনী শিখিয়াছিলেন। পরবর্তীতে ইহারাই গ্রামে কেচ্ছা কাহিনী বলিয়া সবাইকে শুনাইতেন। এ ব্যাপারে জোনাব আলী শেখের পারদর্শীতাই প্রশংসনীয় ছিল।

প্রতি বৎসর কলেরা, বসন্ত এবং ম্যালেরিয়া জ্বরে বহুলোক বিনা চিকিৎসায় অকালে প্রাণ হারাইত, ঘরালিয়া গ্রামে চারু ভুষণ চক্রবর্তী এম, বি, এস ডাক্তার এবং

দৌলতপুরে অশ্বিনী চক্রবর্তী এল,এম,এফ ডাক্তার ছাড়া আর কোন ডাক্তার ঐ অঞ্চলে ছিল না। গ্রামের অশিক্ষিত এক শ্রেণীর লোকের নিকট গ্রাম্য ভন্ড ফকির ফকরার বেশ আদর ছিল। ঐ সব ভন্ড ফকিরদের চিকিৎসার জন্য ডাকিলে উহারা চিকিৎসার নামে অপচিকিৎসা করিয়া রোগীর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করিত। গ্রামে কলোরা মহামারী আকারে দেখা দিলে গ্রামের ১০/১২ জন লোক একত্রে মিলিয়া আল্লার জেকের করিতে করিতে রাত্রিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিত। গ্রামে যাহাতে কলেরা বসন্তের মত কোন ভীষণ রোগ না আসে সেই জন্য প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে গ্রামের লোকেরা চাঁদা তুলিয়া সিন্নি করিত। ইহাকে খোদাই সিন্নি বলা হইত। আতপ চাউল, দুধ কলা-চিনি দিয়া পায়েস পাক করা হইত এই পায়েস বিশেষ করিয়া পথচারীদিগকে এবং পাশ্ববর্তী লোকদিগকে খাওয়ান হইত। গ্রামের সকলেই উহা খাইত।

ধর্মীয় উৎসব হিসাবে ঈদ-উল ফিতর্ এবং ঈদ-উল আজহা পালন করা হইত। উভয় ঈদের নামাজই গ্রামের কেতাব আলীদের বাহির বাড়ীতে পড়া হইত। সরকারী চাদোয়া টাংগাইয়া দেওয়া ইহত। গ্রামের সকলেই ক্ষীর ও খিচুরী পাক করিয়া ঐ বাড়ীতে নিয়া আসিত এবং নামাজান্তে সকলে একত্রে বসিয়া খাইত। খাবার পাত্র হিসাবে কলার পাতা ব্যবহার করা হইত।

আগের দিনে কম বয়সেই ছেলে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হইত। ছেলের বয়স ১৬/১৭ বৎসর এবং মেয়ের বয়স ১২/১৩ বৎসর হইলেই অভিবাবকেরা বিবাহের চিন্তা করিতে থাকিতেন। বর পক্ষের লোকেরা পাত্রী দেখিতে আসিলে, অনেক ক্ষেত্রে লজ্জায় কোন কোন মেয়ে ডোলের ভিতরে পলাইয়া থাকিত। ঠিক এমনি ভাবেই পাত্রী পক্ষের লোকরা বর পক্ষের বাড়ীতে গেলে ছেলেকেও পার্শ্ববর্তী বাড়ী হইতে খুঁজিয়া আনিতে হইত। মেয়েকে যথাসম্ভব সাজাইয়া লম্বা ঘোমটা দেওয়াইয়া হাজির করা হইত এবং ঘোমটা সরাইয়া কেবল মুখ দেখান হইত। মেয়ে চোখ বন্ধ করিয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকিত। বিবাহের ব্যাপারে ছেলে বা মেয়ের নিজস্ব কোন ভূমিকা ছিল না। মুরব্বিরা যাহা করিতেন ছেলে মেয়েকে বিনা বাক্যে তাহাই মানিতে হইত। ব্যতিক্রম সমাজে অত্যন্ত নিন্দনীয় ছিল। কিন্তু আজকাল ছেলে মেয়েদের বিবাহের ব্যাপারে পিতাপাতার মতামত অনধিকার হস্তক্ষেপ বলিয়া প্রত্যাখ্যাত।

পণ প্রথা পূর্বেও ছিল কিন্তু বর্তমান প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত। তখনকার সময়ে ছেলের পক্ষ হইতে মেয়ের পক্ষকে পণ স্বরূপ কিছু টাকা ২৫ টাকা হইতে ১০০ টাকা দেওয়ার প্রথা ছিল।

ছেলে বা মেয়ের বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইয়া যাওয়ার পর সমাজের সবাইকে একদিন রাত্রে দাওয়াত করা হইত। ইহাকে জানানীর দাওয়াত বলিত। সমাজের সকল লোক আসার পর আনুষ্ঠানিকভাবে তাহাদের নিকট বিবাহের কথা জানান হইত এবং বিবাহ উপলক্ষে প্রয়োজনীয় লোকজনের সাহায্য প্রার্থনা করা হইত। সক্ষম ব্যক্তিরা ছেলে মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে সমাজের সবাইকে ভোজ দিয়া থাকিত। সমাজের মাতবরেরা এই উপলক্ষে কে কি কাজ করিবে তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। যেমন, কে হাট হইতে মাছ তরিতরকারী আনিবে, কে দুধ ক্রয় করিয়া আনিবে, কে কে পাক করিবে কে কে কলার পাতা কাটিবে ইত্যাদি। কলার পাতা খাবার পাত্র হিসাবে ব্যবহার করা হইত। সব কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর সবাইকে ক্ষীর ও মুড়ী খাওয়ান হইত। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট লোকজনের সাহায্যে বিবাহ অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইত। বলা বাহুল্য এসব কাজের জন্য কাহাকেও কোন পয়সা দিতে হইত না।

আমি যে সময়ের কথা লিখিতেছি ঐ আমলে কোন মহিলা তাহার স্বামীর নাম, ভাসুর, শ্বশুর, দাদা শ্বশুর, মামা শ্বশুর প্রভৃতি মুরব্বিস্থানীয় লোকদের নাম উচ্চারণ করাটা একাধারে যেমন আদবের গুরুতর খেলাপ বলিয়া মনে করিত অন্যদিকে তেমনই মহাপাপ বলিয়া গণ্য করিত। স্বামীকে স্ত্রীরা সাধারণত "আমাগো বাড়ীর উনি" বলিয়া চিহ্নিত করিত। এ প্রসঙ্গে একটা গল্প উল্লেখ করিতেছি।

কোন এক মহিলার স্বামীর নাম ছিল রহমতউল্যা। মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করিতেন। নামজ শেষে ছালাম ফিরাইতে হয়। কিন্তু মহিলাটির স্বামীর নাম "রহমত উল্যা" হওয়ায় তিনি "আছ্ছালামু আলাইকুম আমাগো বাড়ীর উনি, আছ্ছালামু আলাইকুম আমাগো বাড়ীর উনি" বলিয়া ডানে- বামে ছালাম ফিরাইয়া নামাজ শেষ করিতেন। মহিলাটির বুদ্ধির প্রশংসা করিতেই হয়।

দুধ ভাত একটা বনিয়াদি কথা বা খাবার। যাহাদের গাভী থাকিত না বা যাহাদের দুধ কেনার মত পয়সা থাকিত না এইরকম গরীব বা মধ্যবিত্ত্ব পরিবারের লোকদের জন্য দুধ খাওয়াটা বিলাসীতার মত ছিল, যদিও বর্তমান সময়ের তুলনায় ঐ সব

দিনে দুধের দাম ছিল অতি নগণ্য। বর্ষা কালে দুধের দাম প্রতি সের ছিল দুই আনা হইতে দশ পয়সা এবং শুকনা মৌশুমে প্রতিসের দুধ বিক্রয় হইত দুই পয়সা হইতে চার পয়সা। মাটির পাত্রে করিয়া দুধ বাজারে নেওয়া হইত। পাত্রটাকে দোনা বলা হইত। দৈয়ের প্রচলন খুব বেশী ছিল। যে কোন মেহমানী বা খাওয়া দাওয়া হউক না কেন, দৈ ছিল অতি আবশ্যিক। যে যত ইচ্ছা খাইত, এমনকি, জোর করিয়াও দৈ খাওয়ান হইত। অনেক দৈ অপচয়ও হইত। একমন খাসা দৈ অর্থাৎ অতি উচ্চ মানের দৈ এর দাম ছিল তিন টাকা হইতে চারি টাকা। এক সের খাঁটি ঘি এর দাম ছিল এক টাকা হইতে এক টাকা চার আনা। ঘিএ ভেজালের কথা কেহ চিন্তাও করিত না ঐ আমলে।

মাছে ভাতে বাঙ্গালী কথাটা কেবল কথার কথাই নয়, কথাটার বাস্তবতা অনস্বীকার্য্য। খাদ্য তালিকায় মাছ যেমন আমাদের একটা বিশেষ প্রিয় খাদ্য, তেমনই প্রকৃতির দান তথা খোদার দান এই সম্পদ হইতে ধনী গরীব কেহই বঞ্চিত ছিল না। নদী, নালা, খাল, বিল, পুকুর, ডোবা এক কথায় যেখানে পানি সেখানেই বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন জাতীয় প্রকৃতির দেওয়া বহু মৎস সম্পদে ভর্তি থাকিত। ধনী গরীব সকলের জন্যই ইহা সহজলভ্য ছিল। সামান্য কিছু পরিশ্রমই যথেষ্ট। বাড়ীর নিকটে ডোবা নালায় কৈ, শিং, মাগুর, টেংরা, পুঠি, শোল ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের মাছ এত থাকিত যে তাহা মারিয়া শেষ করা যাইত না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে রাত্রিতে ঢল নামিলে ডোবা নালা হইতে প্রচুর কৈ, মাগুর, শিং ইত্যাদি মাছ মাঠে উঠিত এবং অনেক সময় রান্না করা চুলার ভিতরেও অনেক কৈ মাছ পাওয়া যাইত।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ হইতে ফাল্গুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত বড় বড় বিলে, যেমন তালুক নগরের নিকটবর্তী "মিরকি বিল", ধামসর গ্রামের নিকটবর্তী নাইসার বিলে, খলি সিন্দুরের বিলে, পল দিয়া মাছ ধরা হইত। হাটে বা বাজারে ঢোল দিয়া মাছ মারার দিন জানাইয়া দেওয়া হইত। নির্দ্দিষ্ট দিনে শত শত লোক "পল" লইয়া নির্দ্দিষ্ট বিলে আসিয়া সারিবদ্ধভাবে বিলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত "পল" বাইচ করিয়া বড় বড় বোয়াল, আইর, গুজি, রুহই প্রভৃতি নানা আকারের নানা জাতীয় মাছ মারিত। কেহ কেহ এত বেশী মাছ পাইত যাহা তাহার একার পক্ষে বহন করিয়া বাড়ী নেওয়া কঠিন হইত। আমার বড় ভাই জনাব বরকত আলী প্রায়ই এই প্রকার পল দিয়া মাছ মারিতে যাইতেন এবং প্রচুর

বোয়াল, আইর, গুজি প্রভৃতি বড় বড় মাছ মারিয়া আনিতেন। রান্না করা মাছের তরকারী সকলে খাওয়ার পরও অনেক অবশিষ্ট থাকিত। বাসি তরকারী শীতে জমিয়া সর পরিয়া থাকিত। ভোর বেলা আমরা ঐ সর পরা মাছের তরকারী কর করা ভাত কাসার থালায় করিয়া রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া খাইতাম। স্বাদ আজও মুখে লাগিয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। জীবনে বনিয়াদি প্লেটে বহু বনিয়াদি খাবার খাওয়ার সুযোগ আল্লাহ পাক দিয়াছেন কিন্তু ছোটকালের মায়ের মাটির পাতিলে রান্না করা, কড়কড়া ভাত সর পরা মাছের বাসি তরকারী দিয়া কাসার থালায় করিয়া খাওয়ার স্বাদ এবং আনন্দ কোন দিন পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ছোট বেলায় আমিও বাড়ীর নিকটের ডোবা এবং খালে মাছ ধরিতাম। মাঝে মাঝে সিং মাছের কাটাও খাইতাম। সিং মাছের কাটার যে কি ব্যথা তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। কবির কথায় বলা যায়-

"কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
সিং মাছে কভূ কাটা দেয়নি যারে।"

মুসলমানদের প্রতি তৎকালীন হিন্দুদের আচরণের কথা বিশদভাবে বলিতে গেলে, হিন্দু বিদ্বেষী বলিয়া আখ্যায়িত হইবার ভয়ে, এ সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে কিছু লিখিতে চেষ্টা করিব।

কোন মুসলমান কোন হিন্দু বাড়ীতে গেলে প্রায়ই তাহাকে বসিতে বলা হইত না। অনেকক্ষেত্রে পাটের ছালা বা চট পা দিয়া ঠেলিয়া দিয়া তাহাতে বসিতে বলা হইত।

হিন্দু জমিদারের অধীন কোন গ্রামে কোরবানী করা চলিত না। তেরশ্রীর তদানীন্তন জমিদার কালী নারায়ণ রায় চৌধুরী, তার এক মুসলমান প্রজার দাড়ি কাটিয়া দিয়াছিলেন। ইহা আমি উক্ত কালী নারায়ণ বাবুর ছেলে সিদ্ধেশ্বরী বাবুর নিজ মুখে শুনিয়াছি। উলাইল গ্রামের কৈলাশ ভুইয়া নামক এক ব্যক্তি মাঝে মধ্যে কোন দরকারে আমার পিতার নিকট আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। তিনি ধুমপান করিতেন। অনেক সময় আমি নিজ হাতে কল্‌কিতে তামাক এবং আগুন দিয়া তাহাকে দিলে তিনি সরাসরি আমার হাত হইতে উহা গ্রহণ করিতেন না। কলকি মাটিতে নামাইয়া রাখিলে, তিনি তখন উহা উঠাইয়া টানিতে থাকিতেন। আমার হাতের ছোয়া লাগার ভয়ে তিনি আমার হাত হইতে কল্‌কি নিতেন না।

হারাইয়া যাওয়া ঐ সব দিনের দ্রব্য মূল্যের কথায় যাইবার পূর্বে ঐসব দিনের প্রচলিত মুদ্রা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কাগজের নোট এবং ধাতব মুদ্রা উভয়েরই প্রচলন ছিল। তবে কাগজের নোট হইতে ধাতব মুদ্রা যেমন টাকা, আধুলী, শিকি, দুয়ানী, ডবল পয়সা, এক পয়সা, আধা পয়সা ও পোয়া পয়সার প্রচলই বেশী ছিল, এক ভরি ওজনের খাটি রূপা দ্বারা তৈরী ছিল একটা টাকা। আধুলী ও শিকিও রূপার ছিল এবং দুয়ানী ও এক আনা দস্তার তৈরী ছিল। ডবল পয়সা, এক পয়সা, আধা পয়সা ও পোয়া পয়সা ছিল তামার তৈরী। ৬৪ পয়সায় এক টাকা হইত। এর মধ্যে মেকী টাকা ও আধুলী ছিল। তাই লেনদেনের সময় বৃদ্ধাঙ্গুলী ও তর্জুনীর সাহায্যে টাকা বাজাইয়া নেওয়া হইত। খাঁটি টাকা টন টন করিয়া বাজিত, কিন্তু মেকী টাকা ঠেপ করিয়া বাজিত। মুদ্রা হিসাবে কড়িরও প্রচলন ছিল বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু আমি দেখি নাই।

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের দ্রব্য মূল্যের কথা কিছু লিখিতেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতেই সব জিনিষের মূল্য চড়িতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে বর্তমান পর্য্যায়ে পৌছিয়াছে।

প্রতি ভরি খাটি সোনার মূল্য ছিল ২০ (কুড়ি) টাকা, চাউল (মোটা) প্রতি সের দুই পয়সা হইতে চার পয়সা, মাছ তরিতরকারী প্রভৃতি সমস্ত রকম নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরই মূল্য অত্যন্ত কমছিল। ঐ সময়ে একটা পোয়া পয়সা দিয়াও কোন কোন জিনিষ খরিদ করা যাইত। বেগুন, উচ্ছে, সিম প্রভৃতি যখন প্রচুর আমদানী হইত তখন ঐ সব জিনিষ এক পয়সায় ৪ সের পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত।

আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে যে ১৯৩৬ইং সনে ফরিদপুর জেলায় গোসাইরহাট থানা হইতে ছুটিতে বাড়ী আসার সময় ঢাকার ইসলামপুর হইতে ১ (এক) টাকা দিয়া বেশ মাঝারী রকমের ২৫ (পঁচিশ)টি ফজলি আম ক্রয় করিয়া উহা সোয়ারীঘাটে গয়নার নৌকায় তুলিয়া দেওয়ার জন্য (মিস্তি) কূলীকে এক আনা, ঢাকা সোয়ারীঘাট হইতে “গয়নার” নৌকায় মানিকগঞ্জ আনিতে আট আনা ভাড়া এবং মানিকগঞ্জ হইতে বাড়ী যাইতে এক খানা দেড় মাল্লাইয়া নৌকার ভাড়া মাত্র ৬ (ছয়) আনা দিয়াছিলাম। মানিকগঞ্জ ৩ (তিন) আনা দিয়া হোটেলে খাইয়াছিলাম, বাতাসী মাছের তরকারী, করল্লা ভাজী এবং ডাউল দিয়া।

বাচামারা গ্রামে একটি মাদ্রাসা ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক পর্য্যন্ত দৌলতপুর থানার কোথাও উল্লেখযোগ্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় ঐ সময়ে এই থানায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুবই কম ছিল।

ইংরেজী ১৯৩২ সনে আমি যখন তেরশ্রী হাই স্কুল হইতে ম্যাট্রিক পাশ করি তখন আমার জানা মতে দৌলতপুর থানায় কোন গ্রামে কে কে ম্যাট্রিক পাশ বা তদুর্ধে লেখাপড়া জানিতেন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি।

এম, এ, পাশ

১। বাবু রামগতি সরকার, গ্রাম-গাজিছাইল। তিনি এম, এ, বি, এল পাশ করিয়া কলিকাতা হাই কোর্টে ওকালতী করিতেন। তাঁহার পূর্বে মানিকগঞ্জ মহকুমায় কেহ এম.এ. পাশ করিয়াছিলেন কিনা জানি না।

২। বাবু রমেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, পিতা-শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী, গ্রাম-ভবানীপুর। তিনি খুব সম্ভব ১৯০০ শত শতাব্দীর ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে এম,এ পাশ করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের পর তিনি ভারতে চলিয়া গিয়াছিলেন।

৩। বাবু মন মোহন সরকার, ১নং এ লিখিত বাবু রামগতি সরকার মহাশয়ের ভাতিজা বি,সিএস পাশ করিয়া তিনি সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে চাকুরী পাইয়াছিলেন। ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের সময় ভারতে চলিয়া গিয়াছিলেন।

৪। বাবু বরদা প্রসাদ চক্রবর্তী, গ্রাম-ঘরলিয়া, এম,এ বিএল। তিনি মানিকগঞ্জে ওকালতী করিতেন। তিনি বহু পুর্বেই মারা গিয়াছেন।

বি.এ. পাশ

১। জনাব আবদুর রহমান পিতা আবদুল গণি সরকার, গ্রাম-তালুকহাপানিয়া। তিনি রেল বিভাগের চট্টগ্রামে চাকুরী করিতেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রাক্তন সদস্য জনাব সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের পিতা।

২। বাবু নিবারণ চন্দ্র মন্ডল, পিতা-বাবু সাধন চন্দ্র মন্ডল, গ্রাম-গাজি ছাইল। তিনি মানিকগঞ্জে ওকালতী করিতেন, অল্পদিন হয় তিনি মারা গিয়াছেন।

৩। জনাব মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, গ্রাম-চর মস্তুল, তিনি ঢাকায় ওকালতী করিতেন। অনেক দিন হয় তিনি মারা গিয়াছেন।

৪। জনাব হাবিবুর রহমান, পিতা - বন্দে আলী মিঞা, গ্রাম-চর মস্তুল। তিনি ৩ নং-এ লিখিত উকিল সাহেবের ভাতিজা। রাজস্ব বিভাগের চাকুরী করিতেন। তিনি জীবিত নাই।

৫। জনাব আব্দুল রহমান, পিতা-জনাব মৌলবী নৈমুদ্দিন, গ্রাম-ঘরলিয়া।

৬। বাবু চারুভূষণ চক্রবর্তী, গ্রাম-ঘরলিয়া। দৌলতপুর থানায় তিনিই একমাত্র এম,বি ডাক্তার ছিলেন। তিনি এম,এ পাশের তালিকায় ৪নং এ লিখিত বরদা বাবুর ছোট ভাই। তিনি অনেকদিন পূর্বে মারা গিয়াছেন।

আই, এ ও আই, এস, সি পাশ

১। বাবু নরেশ চন্দ্র সরকার, গ্রাম-গাজিছাইল। তিনি কলিকাতা হইতে এল,এম,এফ ডাক্তারী পাশ করিয়া ছিলেন। তিনি এম,এ পাশের তালিকায় ৩নং এ লিখিত বাবু মন মোহন সরকারের ছোট ভাই। এখন জীবিত নাই।

২। জনাব আব্দুর রহমান, গ্রাম-নিরালী। তিনি পরে বিএ এবং আইন পাশ করিয়া মানিকগঞ্জে ওকালতি করিতেন। অবসর গ্রহণের পর মানিকগঞ্জে তাঁহার নিজ বাসায় বসবাস করিতেছেন। তিনি জীবিত আছেন।

ম্যাট্রিক পাশ

১। জনাব মেছের আলী মিঞা, গ্রাম-ধামসর। তিনি তেরশ্রী হাই স্কুল হইতে ১৯২৮ সনে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছিলেন। তিনি তেরশ্রী প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। তিনি অত্যন্ত ভাল লোক ছিলেন। এখন প্রয়াত।

২। বাবু পঞ্চানন দাস, পিতা-যাদব চন্দ্র দাস, গ্রাম-পাঁচথুবী।

৩। বাবু গুপ্ত প্রসাদ দাস, পিতা-যাদব চন্দ্র দাস, গ্রাম-পাঁচথুবী। তিনি আমার সহিত ১৯৩২ সনে তরশ্রী হাইস্কুল থেকে পাশ করেন। তাঁহারা দুই ভাই-ই ভারতে চলিয়া গিয়াছিলেন।

৪। বাবু দীনেশ চন্দ্র ভৌমিক, পিতা-বাবু নকুল চন্দ্র ভৌমিক। গ্রাম-ভবানীপুর। তিনি পাঠশালায় আমার সহপাঠী ছিলেন। পরে কলিকাতায় তাহার মামা উকীল বাবু রাম গতি সরকার মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া কলিকাতা মিত্র ইনস্টিটিউশান হইতে ১৯৩২ সনে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তিনি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী পাশ করিয়াছিলেন। এখন জীবিত নাই।

৫। জনাব মোহাম্মদ চাঁদ মিঞা, পিতা-জনাব তমিজ মুন্সী, গ্রাম-কাপসাইল। তিনি আমার সহপাঠী এবং ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন, তিনি অল্প বয়সেই মারা গিয়াছেন।

৬। জনাব নয়ান খাঁ, গ্রাম-খলিসাডহরা। তিনি এক পর্য্যায়ে ৬নং কলিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি জীবিত নাই।

৭। জনাব রইচ উদ্দিন আহমেদ, পিতা-জনাব আজিম উদ্দিন আহ্মেদ, গ্রাম-তালুক হাপনিয়া। তিনি প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকতা করিতেন। অনেক পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন।

৮। জনাব ইমান আলী খাঁ, পিতা জনাব মুন্সী গুমান আলী খা, গ্রাম-দৌলতপুর। তিনি আমার সহপাঠী ছিলেন এবং ১৯৩২ সনে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া করটীয়া কলেজ হইতে আই,এ পাশ করার পর রেল বিভাগে চাকুরী করিতেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি মারা গিয়াছেন।

৯। জনাব ইয়াকুব আলী, পিতা-জনাব সৈয়দ আলী। গ্রাম-আবু ডাঙ্গা। তিনি আমার সহপাঠী ছিলেন এবং দারোগা হইয়াছিলেন। চট্টগ্রামে চাকুরী করা কালীন সমুদ্রে জাহাজ ডুবিতে দুঃখজনক ভাবে তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহার লাশও পাওয়া যায় নাই।

১০। জনাব ধনী আহমেদ সরকার, গ্রাম-বাচামারা। তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এক পর্য্যায়ে তিনি ঢাকা জিলা বোর্ডের সদস্যও নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সর্বত্রই তাহার খ্যাতি ছিল।

১১। জনাব আবদুল খালেক মিঞ্যা, গ্রাম-জিয়নপুর। তিনি ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুল হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়াছিলেন। তিনি বাঁচিয়া নেই।

১২। জনাব আইন উদ্দিন আহমেদ, গ্রাম-চরমস্তুল। তিনি তেওতা হাই স্কুল হইতে এন্ট্রাস পাশ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই দৌলতপুর থানায় সর্বপ্রথম এন্ট্রাস পাশ করা ব্যক্তি। তদানীন্তন তেওতার জমিদার কিরণ-শঙ্কর রায়ের সহপাঠী ছিলেন তিনি। তিনি প্রথম দারোগা এবং পরে ইন্সপেক্টর হইয়াছিলেন। ১৯৪০ সনে আমি যখন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ থানায় ছিলাম, তখন তিনি গোপালগঞ্জ সার্কেলের ইন্সপেক্টর ছিলেন। আমাকে দিয়া তিনি ইংরেজীতে বহু বড় বড় রিপোর্ট লিখাইতেন। তাঁহার মত ইংরেজী জানা কোন পুলিশ অফিসার ঐ সময়ে ঐ জিলায় আর কেহ ছিলেন না বলিলে মোটেই অত্যুক্তি হইবে না। তিনি অবসর গ্রহণের পর ফরিদপুর জিলায়ই ইন্তেকাল করেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

১৩। জনাব কুদরত আলী ডাক্তার, গ্রাম-চরমস্তুল। তিনি জনাব আইন উদ্দিন সাহেবের ছোট ভাই। তিনি চা বাগানে চাকুরী করিতেন। তাহার এক ছেলে জনাব বাদশা মিয়া মানিকগঞ্জে এডভোকেট ছিলেন, এখন প্রয়াত।

১৪। জনাব মোমরেজ উদ্দিন আহমেদ, গ্রাম-চরমস্তুল। তিনি ফরিদপুর কালেক্টরী অফিসে চাকুরী করিতেন। তিনি ফরিদপুর টাউনের দক্ষিণ দিকে চরকমলাপুর বাড়ী করিয়াছিলেন। তিনি জীবিত নাই। তাহার ছেলে পিলেরা এখন উক্ত চরকমলাপুরে আছেন।

১৫। জনাব বাহের উদ্দিন আহমেদ, গ্রাম-চরমস্তুল। তিনি ফরিদপুর কালেক্টরীতে চাকুরী করিতেন। তিনি বান্দুটীয়া নিবাসী জনাব আবদুল জব্বার দারোগা সাহেবের বড় মেয়েকে বিবাহ করিয়া ছিলেন। তিনি এখন মৃত, তাঁহার কোন ছেলে বা মেয়ে নাই।

১৬। জনাব মহম্মদ আলী, গ্রাম-চকরিচরণ। তিনি ফরিদপুর রাজস্ব বিভাগে তৌশিলদার ছিলেন। তিনি এখন বাঁচিয়া নাই।

১৭। জনাব আব্দুল গণি মিঞা, গ্রাম-নিলুয়া। তিনি আমরণ গ্রামেই ছিলেন। কোন চাকুরী করেন নাই।

ঘিওর থানাধীন, পয়লা তেরশ্রী, বাঙ্গালা, সিংজুরী, বাইল জুরী প্রভৃতি গ্রাম সমূহে মুসলমানদের ভিতর সর্ব প্রথম ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছিলেন বাঙ্গালা নিবাসী জনাব ফুলচাদ মিঞার ছেলে জনাব আব্দুল গণি মিঞা এবং বাইলজুরী নিবাসী জনাব আরিপ মাতবর সাহেবের ছেলে জনাব আফসার উদ্দিন আহমেদ। তাঁহারা উভয়েই তেরশ্রী হাই স্কুলের ছাত্র এবং আমার ২/৩ বৎসরের সিনিয়র ছিলেন। তাঁহাদের পর পরই সালকার টেক নিবাসী জনাব অছিম উদ্দিন সাহেব ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৩২ সনে।

দৌলতপুর, ঘিরও এবং নাগরপুর থানার কোন গ্রামে কোন মুসলমান মহিলা ঐ সময়ে সামান্যতম লেখাপড়াও জানিতেন কিনা তাহা আমার জানা নাই।

খুব সম্ভব বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ময়মনসিংহ জেলায় টাংগাইল থানাধীন করটীয়ার তদানীন্তন জমিদার জনাব ওয়াজেদ আলী খান পন্নি (চাঁদ মিঞা) সাহেবের পৃষ্টপোষকতায় ঐ গ্রামের ফজিলাতুন নেছা নাম্নী একজন মহিলা এম,এ পাশ করিয়াছিলেন। ফরিদপুরের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জনাব হুমায়ুন কবীর সাহেবের সমসাময়িক ছিলেন তিনি।

সেকালে এই অঞ্চলের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত আমার জানা আলেম সাহেবদের নাম লিখিতেছি।

১। মৌলবী জনাব আব্দুর রহমান, গ্রাম-টেপরী, থানা-দৌরতপুর। তিনি আররা কুমেদ স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। তিনি আমার পিতার একজন ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন।

২। মৌলবী জনাব দরবেশ আলী, গ্রাম-টেপারী। তিনি বার মাসই রোজা রাখিতেন।

৩। মৌলবী জনাব নৈমুদ্দিন, গ্রাম-টুটিয়াম। তাঁহার ছেলের মতিয়র রহমান এখনও জীবিত।

৪। মৌলবী জনাব নৈমুদ্দিন, গ্রাম-ঘরলিয়া

৫। মৌলবী জনাব কছিম উদ্দিন, গ্রাম-পয়লা, থানা-ঘিওর। তাঁহার রচিত কয়েকটি ধর্ম গ্রন্থ আছে।

৬। মৌলবী জনাব আবদুল আজিজ, গ্রাম-আন্দিবাড়ী, থানা-নাগরপুর। তিনি জমিদারের নিকট হইতে তাঁহার এলাকার কৃষকদের জমির খাজনার ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা আদায় করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ অঞ্চলের লোকেরা আজও ঐ সুবিধা ভোগ করিতেছে। উহা "সরেকমি" নামে অবিহিত।

৭। মৌলবী জনাব আব্দুস শুকুর, গ্রাম-বলারামপুর। তিনি মানিকগঞ্জের বর্তমান পীর জনাব আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকী সাহেবের নানা।

৮। মৌলবী জনাব আবুল কাশেম, গ্রাম-বলারামপুর।

৯। মৌলবী জনাব তৈয়বউদ্দিন, গ্রাম-দপতিয়ার, থানা-নাগরপুর।

১০। মৌলবী জনাব ফরমান আলী খাঁ, গ্রাম-আহুলিয়া। তিনি তেওতা হাই স্কুলের হেড মৌলবী ছিলেন।

১১। মৌলভী জনাব নছিমুজ্জমান, গ্রাম-তেরশ্রী, থানা-ঘিওর। তিনি তেরশ্রী হাই স্কুলের হেড মৌলবী ছিলেন। আমি তাঁহার ছাত্র। তাঁহার আদিবাড়ী ছিল ময়মনসিংহ জেলার মির্জাপুর থানায় হালালিয়া নামক গ্রামে। তিনি মানিকগঞ্জের বর্তমান পীর জনাব আযহারুল ইসলাম সাহেবের পিতা।

১২। মৌলবী জনাব আব্দুল মোনেম (মনি মিঞা), সাং-আন্দিবাড়ী, থানা-নাগরপুর। তিনি মেঘনা ঈদের মাঠে ইমামতি করিতেন।

১৩। মৌলবী জনাব জহির উদ্দিন (তারা মিঞা মৌলবী), সাং-আন্দিবাড়ী, থানা-নগপরপুর।

১৪। মৌলবী জনাব আব্দুল ওয়াদুদ, ৭নং ক্রমিক এ উল্লেখিত মৌলবী সাহেব তাঁহার পিতা।

১৫। মৌলবী জনাব আব্দুল খালেক, ১নং ক্রমিক নং এ উল্লেখিত মৌলবী সাহেব তাঁহার পিতা। তিনি ধামরাই থানার অন্তর্গত মৈশা লোহা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করিতেন।

১৬। মৌলবী জনাব আজমত উল্লাহ, সাং-টেংরীপাড়া, থানা-নাগরপুর।

১৭। জনাব হাফেজ হাতেম, সাং-ধুবরিয়া, থানা-নাগরপুর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের মধ্যবর্তী সময়ের আমাদের অঞ্চলের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি যাহাদিগকে আমি নিজে দেখিয়াছি বা যাহাদের নাম শুনিতাম নিম্নে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি।

১। জনাব তমিজ উদ্দিন মুন্সী, গ্রাম-পাঁচথুবী। তিনি বহুদিন সিংজুরী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। গ্রামে মোল্লাকী করিতেন। কৃষিকাজে তাঁহার প্রচুর দক্ষতা ছিল। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। আমার পিতার একজন অতি ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন তিনি।

২। জনাব সদর উদ্দিন মুন্সী, গ্রাম-পাঁচথুবী। তিনি উক্ত তমিজ উদ্দিন মুন্সী সাহেবের সহোদর ভ্রাতা। তিনি অত্যন্ত ধর্ম প্রাণ লোক বলিয়া সবাই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত।

৩। জনাব এলাহী বকস মুন্সী, গ্রাম-ধামসর। তিনি ওয়াইসি তরিকার লোক ছিলেন। তাহার অনেক সাগরেদ ছিল। তিনি কিছু ধর্মীয় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন। বর্তমান ধামসরের হাট তাঁহারই চেষ্টার ফসল।

৪। জনাব আব্দুল ওয়াহেদ, তিনি এলাহী বকস সাহেবের ভাতিজা। ১৯৩৪ সনে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া চাচার পন্থায়ই জীবন যাপন করিতেন।

৫। জনাব নোয়াই মুন্সী, গ্রাম-কাক্না। তিনি প্রাক্তণ ইউনিয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান জনাব আবদুল আজিজ সাহেবের পিতা। তিনি একজন অত্যন্ত ধার্মিক লোক হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

৬। জনাব ইয়াসিন আলী মৃধা, গ্রাম-উয়াইল। তিনি ৬নং কলিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব আরশেদ আলী মৃধা সাহেবের পিতা। একজন প্রভাবশালী লোক বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

৭। জনাব বাছের সরকার, গ্রাম-উয়াইল। তিনি সরকারী চাকুরী করিতেন। তিনি এলাকার একজন বিশিষ্ট নাম করা ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

১৭। জনাব আজিম উদ্দিন আহমেদ, তিনি-১৬নং সিরিয়ালে লিখিত জনাব জিগীর উল্যা সাহেবের ছেলে। তিনি বেশ কয়েক বৎসর ৬নং কলিয়া ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তালুকনগর হাই স্কুলে তাহার প্রচুর অবদান আছে।

১৮। জনাব জমসের আলী, গ্রাম-তালুকহাপানিয়া। তিনি ঢাকা পিলখানা রোডের তদানীন্তন পীর জনাব সৈয়দ বোরহান উল্যা কাদরী সাহেবের খলিফা ছিলেন। তাঁহারও অনেক মুরীদ ছিল।

১৯। জনাব খবির উদ্দিন মুন্সী, গ্রাম-তালুকহাপানিয়া। তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিলেন। আমাদের গ্রামে মোল্লাকী করিতেন। তিনি খুব ভাল পুথি পাঠ করিতে পারিতেন।

২০। জনাব আবদুল কাদের মাষ্টার, গ্রাম-তালুকহাপানিয়া। তিনি স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। তিনি এখন জীবিত নাই।

২১। জনাব মাধু শেখ, গ্রাম-তালুকহাপানিয়া। তিনি দফাদারী চাকুরী করিতেন এবং খুব ভাল পুঁথি পাঠ করিতে পারিতেন।

২২। জনাব আজগর আলী দেওয়ান, গ্রাম-আটিয়া উয়াইল। তিনি তালুকহাপানিয়ার খবির উদ্দিন মুন্সী সাহেবের পূর্বে আমাদের গ্রামে মোল্লাকী করিতেন। অত্যন্ত ধর্ম প্রাণ লোক ছিলেন তিনি।

২৩। জনাব মকবুল আলী দেওয়ান, গ্রাম-আটিয়া উয়াইল। সুবক্তা হিসাবে তাঁহার প্রচুর খ্যাতি ছিল।

২৪। জনাব আজাহার আলী বয়াতি, গ্রাম-তালুক হাপানিয়া। তিনি পৈক্কা দাই নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রথম কবিগান গাইতেন এবং পরে জারী গান করিতেন। হরিরামপুর থানার তদানীন্তন বিখ্যাত বয়াতী বদর উদ্দিন এবং ইব্রাহীমের সহিত পাল্লা করিয়া জারী গান করিতেন। তিনি বেশ কিছু বাউল গানও রচনা করিয়াছিলেন।

২৫। জনাব কোরবান আলী মুন্সী (কুরানমুন্সী), গ্রাম-টেপারী। তিনি একজন ধর্মভীরু সৎ লোক বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

২৬। জনাব হাবিব উল্যা মুন্সী (হবুল্যামুন্সী), গ্রাম-টেপরী। তিনি একজন খোদাভীরু লোক ছিলেন। তিনি খুব মধুর স্বরে আজান দিতে পারিতেন।

৮। জনাব আইন উদ্দিন আহমেদ, গ্রাম-উলাইল। তিনি একজ লেখাপড়া জানা সৎলোক ছিলেন।

৯। জনাব হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, গ্রাম-উলাইল। তিনি ৮নং ক্রমিকে লিখিত ব্যক্তির সহোদর ভ্রাতা। তিনি অত্যন্ত সাহসী এবং উচিৎ বক্তা লোক ছিলেন। তখনকার জামানায়ও তিনি হিন্দুদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ভাল লেখা পড়া জানিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা আজও বিদ্যমান।

১০। জনাব হাজী ওয়াহেদ্দ আলী, গ্রাম-উলাইল। তিনি আমার সহপাঠী ছিলেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই পড়া ছাড়িয়া সংসারের কাজকর্ম দেখাশুনা করিতেন। ৮ এবং ৯নং ক্রমিকে লিখিত ব্যক্তিদ্বয়ের ছোট ভাই ছিলেন তিনি। এখন প্রয়াত।

১১। জনাব কাজেম উদ্দিন মুন্সী, গ্রাম-উলাইল। তিনি একজন অত্যন্ত ধার্মিক এবং মহৎ চরিত্রের লোক ছিলেন। আমার পিতার সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্টতা ছিল।

১২। জনাব জয়নাল মাতবর, গ্রাম-উলাইল। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাষী এবং অতিথি পরায়ণ লোক ছিলেন। মাতবর হিসাবেও তাহার বেশ নাম ছিল।

১৩। জনাব নাজির আলী খাঁ, গ্রাম-আহুলিয়া। একজন জনদরদী লোক হিসাবে তিনি খ্যাত।

১৪। জনাব আব্দুল গণি সরকার, গ্রাম-তালুকহাপানিয়া। তিনি কোন জমিদারের তহশীলদার ছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। এখনকার দিনে লেখাপড়া জানা লোকদিগকে সরকার বলিত। সম্ভবতঃ তিনিই ঐ গ্রামের সর্বপ্রথম লেখাপড়া জানা লোক।

১৫। জনাব জামাল খাঁ মুন্সী, গ্রাম-তালুকহাপানিয়া। তিনি চরমস্তুল গ্রামের জনাব বন্দে আলী মিয়ার বাড়ীর গৃহ শিক্ষক ছিলেন।

১৬। জনাব জিগির উল্যা মাতবর, গ্রাম-তালুকহাপানিয়া। তিনি ঐ সময়ের একজন অত্যন্ত নাম করা মাতবর ছিলেন। তাঁহার বিচার ন্যায্য এবং নিরপেক্ষ ছিল বলিয়া সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত।

২৭। জনাব সদর আলী মুন্সী, গ্রাম-বহরা। তিনি দফাদারী চাকুরী করিতেন। বাউল গানও তিনি খুব ভাল গাইতেন।

২৮। জনাব খোয়াজ আলী মোল্লা, গ্রাম-বহরা। তিনি কিছু লেখাপড়া জানিতেন এবং মোল্লাকী করিতেন।

২৯। জনাব বাদশা আলী মোল্লা, গ্রাম-বহরা। তিনি মহুরীগিরী করিতেন অর্থাৎ দলিল পত্র লিখিতেন। ২৭ ও ২৮নং সিরিয়ালে লিখিত এবং তিনি ছাড়া ঐ সময়ে বহরা গ্রামে আর কোন লেখাপড়া জানা লোক ছিল না।

৩০। জনাব যাদু মাতবর, গ্রাম-বহরাবাড়ী (যুগিন্দা)। তিনি একজন সৎ লোক এবং গ্রামের একজন মাতবর ছিলেন।

৩১। জনাব বশরত মাতবর, গ্রাম-যুগিন্দা। তিনি গ্রামের একজন মাতবর ছিলেন। তিনি অনেক মাছলা মাছায়েল জানিতেন।

৩২। জনাব আবদুল গণি, পিতা-নজিব উল্যা, গ্রাম-ভবানীপুর। তিনি লেখাপড়া জানা লোক ছিলেন। সংসারের কাজ কর্ম দেখাশুনা করিতেন।

৩৩। জনাব নাজিমুদ্দিন, পিতা-যাদু মাতবর। তিনি সামান্য লেখা পড়া জানিতেন এবং ছোট খাট ব্যবসা করিতেন।

৩৪। জনাব মিঞাজান মাতবর, গ্রাম-বহরা, বাড়ী-(যুগিন্দা)। আমাদের গ্রামের যত লোককে আমি দেখিয়াছি তাহাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রবীণ, ছেলে বুড়ো নির্বিশেষে সবারই সহিত তাঁহার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত সৌজন্যমূলক। আপনি ছাড়া কখনও কাহাকেও তিনি তুমি বলিতেন না। তাঁহার ঘোড়া পালার সখ ছিল। তিনি তরমুজ বাঙ্গির আবাদ করিতেন এবং গ্রামের প্রায় সবাইকে বিনা পয়সায় তাহা খাওয়াইতেন। তিনি অত্যন্ত রসিক প্রকৃতির লোক বলিয়া গ্রামের সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিত।

৩৫। জনাব কুতুবউদ্দিন। তিনি উক্ত মিঞাজান মাতবর সাহেবের ছেলে। তিনিও খুব সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। আমার পিতার মৃত্যুর পর তিনিই আমাদের গ্রামের সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ লোক ছিলেন। একশত বৎসরেরও বেশীকাল তিনি জীবিত ছিলেন।

৩৬। জনাব শেখ জোনাব আলী, গ্রাম-বহরাবাড়ী (যুগিন্দা)। তিনি বহুরকমের কেচ্ছাকাহিনী জানিতেন। তিনি নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু তাহার বাচন ভঙ্গি অত্যন্ত সুন্দর ছিল। কেচ্ছা বলার সময় কেচ্ছার নায়ক নায়িকার বিরহ, মিলন, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ প্রভৃতির বিবরণ কখনও কথায় কখনও বা গানের মাধ্যমে যখন যেমন দরকার তেমন করিয়াই সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিতেন। মনে হইত যেন বাস্তব ঘটনাই বিবৃত হইতেছে। তাঁহার বর্ণনার ভিতর এমনই হৃদয়স্পর্শী আবেদন ছিল যে, শ্রোতাদের কাহারও কাহারও চোখে পানি আসিত। তখনকার দিনে ঐ অঞ্চলের উক্ত প্রকার লোকগাঁথার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। তাহার কোন উত্তরসুরী নাই। তিনি এখন হারাইয়া যাওয়ার পথে।

৩৭। বাবু নকুল চন্দ্র ভৌমিক, গ্রাম-ভবানীপুর (রামবাটি)। তিনি আমার পিতার সহপাঠী এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। তিনিও আরড়া কুমেদ স্কুল হইতে আমার পিতার সহিত ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া প্রথম প্রাইমারী স্কুলে মাষ্টারী করিতেন এবং পরে কাপড়ের দোকানদারী করিতেন।

৩৮। বাবু সুরেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী, গ্রাম-ভবানীপুর। তিনি গুরু ট্রেইনিং পাশ করিয়া পাঠশালায় মাষ্টারী করিতেন। তিনিই আমার প্রথম বাল্য শিক্ষক। তাঁহাকে পন্ডিত মহাশয় বলিতাম।

৩৯। বাবু মাধব চন্দ্র মন্ডল, গ্রাম-গাজিছাইল। তিনি আমার পিতার একজন বন্ধুলোক ছিলেন, তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সৎলোক ছিলেন।

৪০। বাবু সুকন্দ চন্দ্র সরকার, গ্রাম-গাজিছাইল। তিনি গুরু ট্রেইনিং পাশ করিয়া উলাইল হাফিজ উদ্দিন সাহেবের বাড়ীর পাঠশালায় মাষ্টারী করিতেন এবং ইউনিয়ন বোর্ডের কেরানী পদে চাকুরী করিতেন।

৪১। বাবু দুর্যোধন সরকার, গ্রাম-ইয়ারপুর। তিনি সকাল বেলা বহরা পাঠশালায় এবং ১০ টায় মান্দারতা পাঠশালায় পড়াইতেন। তিনি আমার দ্বিতীয় বাল্য শিক্ষক। সকলেই তাঁহাকে পন্ডিত মহাশয় বলিত। তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও করিতেন। তাঁহার ছোট ভাই মেঘলাল সরকার এখনও জীবিত আছেন।

৪২। বাবু যুধিষ্ঠিরলাল সরকার, গ্রাম-টুটিয়াম। তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন। তিনিই ছিলেন আমাদের এ অঞ্চলের একমাত্র পুরাতন হোমিও ডাক্তার। পরবর্তীতে তাঁহার ছেলে যতীন্দ্র মোহন সরকার পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতেন এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন। তিনি এখন জীবিত নাই।

এখন তেরশ্রী হাইস্কুল সম্বন্ধে কিছু লেখার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। তেরশ্রীর জমিদার বাবু কালীনারায়ন রায় চৌধুরী মহাশয় জীবিত থাকিতে তেরশ্রীতে কোন পাঠশালাও ছিলনা; প্রজারা লেখাপড়া শিখিয়া শিক্ষিত হোক তাহা উক্ত জমিদার মহাশয় মোটেই পছন্দ করিতেন না বলিয়া শুনিয়াছি। প্রজাদের দ্বারা উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্খায় তিনি প্রজাদের ভিতর শিক্ষাবিস্তারের বিরোধী ছিলেন।

১৯০০ সনের বিশের দশকের পর উক্ত জমিদার বাবু কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুর পর তদানীন্তন ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার বারহাট্টা থানার বাবু শৈলজানন্দন মহলানবীশ বি, এ মহাশয়কে জমিদারী পরিচালনা করার জন্য ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়। তিনি একজন বিদ্যানুরাগী লোক ছিলেন। তিনি স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদের সাহায্য সহযোগিতায় তেরশ্রীর বর্তমান স্কুল স্থাপন করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা।

ঐ সময়ে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত না হইলে ঐ অঞ্চলে ঐ সময়ে যারা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন তাহদেরও লেখাপড়া হইতো কিনা সেই বিষয়ে প্রচুর সন্দেহের অবকাশ আছে। এমনকি আমারও লেখাপড়া হইতো কিনা তাহা বলা কঠিন। কাজে কাজেই আমরা তথা ঐ অঞ্চলের সকলেই তাহার কাছে চির ঋণী।

এই স্কুলের প্রথম হেডমাস্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন তদানীন্তন ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত নাগরপুর থানাধীন দারাকুমুল্লী নামক গ্রামের জনাব সৈয়দ আব্দুল হাই বি, এ, সাহেব। তিনি জায়গীর থাকিতেন পয়লা গ্রামের জনাম নছুমুদ্দিন জমাদার সাহেবের বাড়ীতে। তিনি ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

আমি যখন ক্লাস সেভেন/এইটে পড়ি তখন নিম্নলিখিত শিক্ষকগণ তেরশ্রী স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন ঃ-

১. বাবু বিধুভূষণ চক্রবর্তী- বি, এ, বি, টি। বাড়ীঃ পাবনা জেলায়।

২. মৌলভী জনাব নছিমুজ্জামান, হেড মৌলভী। বাড়ীঃ গ্রাম-হালালিয়া, থানা-মির্জাপুর, (তিনি মানিকগঞ্জের বর্তমান পীর আযহারুল ইসলাম সিদ্দিকির পিতা।)

৩. জনাব ঈমানউদ্দিন আহম্মদ বি, এ। বাড়ীঃ গ্রাম-কুকুর তারা, থানা-ঘিওর।

৪. জনাব আবদুল আজিজ বি, এ। গ্রাম-বরিকান্দি, থানা-ফুলপুর, ময়মনসিংহ।

৫. বাবু যোগেন্দ্র সাহা। গ্রাম-তেওতা, থানা-শিবালয়।

৬. বাবু কুলদা মোহন কর। গ্রাম-গাঙ্গাবিহারী, থানা-নাগরপুর।

৭. বাবু হরেন্দ্র চন্দ্র সরকার। গ্রাম-বাঙ্গালা, থানা-ঘিওর।

৮. জনাব আবদুল আজিজ মিয়া। বাড়ীঃ তেওতা।

৯. বাবু প্রকাশ চন্দ্র দত্ত ডি, এম। বাড়ীঃ নোয়াখালী।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান হইতে এই অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে তখনকার দিনের শিক্ষার এক অতি করুণ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে ইহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বর্তমানে দৌলতপুর থানায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই এলাকায় বহু মহিলা এবং পুরুষ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছেন যাহার সঠিক পরিসংখ্যান দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু আমার পরিবারেই আমার এক ছেলে ও পাঁচ মেয়ে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করিয়াছে এবং আমার চাচাতো ভাই তৈয়ব উদ্দিনের ৪ মেয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং উহাদের একজন বর্তমানে টাঙ্গাইল কুমুদিনী সরকারী মহিলা কলেজে অধ্যাপনা করিতেছে।।

অতীত নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী তবে ক্রমশঃ অপসৃয়মান।

বর্তমান ক্ষণস্থায়ী ও চলমান।

ভবিষ্যৎ সুপ্ত, অনির্দিষ্ট ও অজানায় আচ্ছন্ন।

এই জন্যই অতীত অত্যন্ত মূল্যবান।

আমার এলাকার সদ্য অতীতের

সমাজ ও হারাইয়া যাওয়া কিছু মানুষের

স্মৃতিচারণের জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।